ফিকহের সুউচ্চ মাকামে

এক যুগান্তকারী জীবন

ফকীহকূলের শিরোমণি

হযরত মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহ.)- এর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

মাহমুদুর রশীদ

ফাজেলে দারুল উলুম হাটহাজারী

বিন্যাস

১. জন্ম, বংশপরিচয় এবং বেড়ে ওঠার পরিবেশ

২. তালিবুল ইলম ফয়জুল্লাহ, হাটহাজারী ও দেওবন্দে

৩. দ্বীনি ও ইলমি খিদমতের মজলিস

৪. ঘরসংসার ও পারিবারিক শিক্ষা পরিচালনা

৫. ফকীহগণের জন্য উত্তম আদর্শ এবং পরহেজগারদের উজ্জ্বল নক্ষত্র

৬. তাঁর রচিত মুক্তাগাঁথা কিতাবাদি ও রিসালাসমূহ

৭. চিরন্তন সফর ও রফিকে আলার সান্নিধ্যে গমন (ইন্তেকাল)

মুফতি-এ-আজম ফয়জুল্লাহ (রহ.): তাঁর ইলমি জীবন ও সংস্কারমূলক কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. জন্ম, বংশপরিচয় এবং বেড়ে ওঠার পরিবেশ:

জন্ম ও বংশপরিচয়: ইতিহাসের ধারা পরিবর্তনকারী এই প্রতিভাধর সন্তান ১৩১০ হিজরিতে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানাধীন 'মেখল' গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ফাজেল হেদায়েত আলী চৌধুরী এবং মাতা ছিলেন পরম ধার্মিক ও দয়াবতী রহীমুন নিসা।

তাঁর পারিবারিক শেকড় সম্পর্কে জানা যায়, তাঁর পূর্বপুরুষগণ মূলত বাংলাদেশের 'গৌড়' অঞ্চল থেকে চট্টগ্রামে হিজরত করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য নাতি মাওলানা উসমান ফয়জীর গবেষণা ও অনুসন্ধান অনুযায়ী, এই পরিবারটি মূলত দক্ষিণ আরব, বিশেষ করে পুণ্যভূমি ইয়েমেন থেকে গৌড় অঞ্চলে এসেছিলেন। এই মহৎ পরিবারের উর্ধ্বধস্তন বংশধারা মহান সাহাবী এবং মুসলিম জাহানের খলিফা হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়েছে।

পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থা: তৎকালীন সময়ে দেশটি এক কঠিন ধর্মীয় ও সামাজিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সমাজ ধর্ম ও দ্বীনদারির নামে ঘরবাড়ি, গ্রাম এবং পাড়া-মহল্লায় ছড়িয়ে পড়া নানা প্রকার বিদআত (ধর্মীয় উদ্ভাবন), অপকর্ম এবং কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল।

অন্ধকারের এই চরম মুহূর্তে মহান আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য এবং সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য 'নবীগণের উত্তরসূরি' হিসেবে কতিপয় হক্কানী আলেম দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন। মেখল গ্রামে জন্মগ্রহণকারী এই নেককার সন্তানই ছিলেন সেই জাগরণের সবচেয়ে বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি পরবর্তীতে ইলম, আমল এবং চিন্তাধারায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হন এবং ছোট-বড় সবার কাছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভ করেন।

২. তালিবুল ইলম ফয়জুল্লাহ, হাটহাজারী ও দেওবন্দে:

শিক্ষা জীবনের সূচনা: হযরত ফয়জুল্লাহ (রহ.) ১৩২০ হিজরিতে (১৯০১ খ্রিস্টাব্দ) জামিয়া হাটহাজারীতে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবন শুরু করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১০ বা ১১ বছর। এই জামিয়া থেকে শিক্ষা সমাপনকারী শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে মুফতি-এ-আজম ফয়জুল্লাহ (রহ.) অন্যতম। শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে সততা ও তাকওয়ার ছাপ স্পষ্ট ছিল, এমনকি ইবাদতের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং দুনিয়াবি খেল-তামাশা থেকে দূরে থাকার কারণে মানুষ তাঁকে "জন্মগত আল্লাহর অলি" বলে অভিহিত করত।

একটি স্মরণীয় ঘটনা: জামিয়ায় ছাত্র থাকাকালীন তাঁর সম্পর্কে একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। যেদিন প্রথম তিনি সবকে পর্দার গুরুত্ব এবং পরনারী থেকে দূরে থাকার বিষয়টি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এটি এতটাই নিখুঁতভাবে পালন করতে শুরু করেন যে, নিজের ঘরে প্রবেশ করা পর্যন্ত বন্ধ করে দেন—এই ভয়ে যে তাঁর মাতার ওপর নজর পড়ে কি না! কারণ তখন ছোট হওয়ার কারণে তিনি ‘মাহরাম’ (যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন হারাম এবং দেখা দেওয়া জায়েয) এবং ‘গাইরে মাহরাম’ (যাদের দেখা দেওয়া অবৈধ) -এর পার্থক্য বুঝতেন না। পরবর্তীতে তাঁর পিতা তাঁকে মাদরাসায়

তাঁর উস্তাদের কাছে নিয়ে যান এবং উস্তাদজি বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে বলার পর তিনি শান্ত হন। এই ঘটনাটি সবাইকে বিস্মিত করেছিল এবং প্রমাণ করেছিল যে, তিনি দ্বীনি হুকুম পালনে কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

ছাত্রজীবন ও কৃতিত্ব: তিনি এই জামিয়ার আঙিনায় টানা দশ বছর অতিবাহিত করেন। অত্যন্ত মেধা ও যোগ্যতার সাথে তিনি শরয়ি জ্ঞান অর্জন করে 'মিশকাতুল মাসাবীহ' জামাত পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করেন। এই সময়ে তাঁর প্রখর মেধা ও পরহেজগারির কারণে তিনি শিক্ষকদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন এবং সহপাঠীদের কাছেও ব্যাপক সম্মানের পাত্র ছিলেন, যারা তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত হতো।

পথচলার সাথী ও ইলমি বিশ্বস্ততা: ছাত্রজীবনে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত দুজন বন্ধু ছিল, যারা পরবর্তীতে বাংলাদেশের বরেণ্য আলেম হিসেবে পরিচিতি পান। তারা হলেন: ১. জিরি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আহমদ হাসান (রহ.)। ২. শাহ আব্দুল মজিদ (রহ.), যিনি ‘শাহ সাহেব’ নামে পরিচিত (মজিদিয়া মাদরাসা, মাদার্শার প্রতিষ্ঠাতা)।

এই দুই প্রথিতযশা আলেম নিয়মিত তাঁর বাড়িতে আসতেন এবং জটিল ও অস্পষ্ট মাসআলাগুলো সমাধানের জন্য তাদের এই মেধাবী বন্ধু ফয়জুল্লাহর সাথে কিতাবের পড়া আলোচনা করতেন ও বুঝে নিতেন।

হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর অন্যতম ঘনিষ্ঠ শাগরিদ মাওলানা আসেম রহ. একটি আবেগঘন ঘটনা বর্ণনা করেছেন; একদিন হযরত মাওলানা আহমদ হাসান (রহ.) জামিয়া হাটহাজারীতে তাশরীফ আনেন এবং অত্যন্ত বিনয় ও সত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ওলামায়ে কেরাম ও তলাবায়ে ইজামের এক বিশাল মজলিসে বলেন:

"আজ ওলামা ও তলাবাদের এই বিশাল মজলিসে খতীব ও বক্তা হিসেবে আমার দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারাটা, প্রথমত আমাদের আসাতেযায়ে কেরামের দোয়ার বরকত, আর দ্বিতীয়ত আমার ভাই ও বন্ধু মুফতি ফয়জুল্লাহর মেহনত এবং আমাদের পেছনে তাঁর ধৈর্য ধারণের বরকত। ছাত্রজীবনে আসাতেযায়ে কেরামের কাছ থেকে সরাসরি কঠিন কঠিন দরসগুলো পুরোপুরি আয়ত্ত করার সক্ষমতা আমার ছিল না; বরং আমি কেবল বরকতের জন্য দরসে বসতাম। এরপর আমরা ফয়জুল্লাহর কাছে যেতাম, আর তিনি আমাদের কিতাব হল (সমাধান) করে বুঝিয়ে দিতেন। আমার ইলমি যিন্দেগীতে তিনি আমার উস্তাদ ও রাহবারের ভূমিকায় ছিল।"

মাদরাসা জীবনের এই মারহালায় হযরতের অন্যতম প্রধান উস্তাদ ছিলেন পরহেজগার আলেম ও বিনয়ী মুরব্বী হযরত মাওলানা আবু হাসান খন্দকিয়াভী (যিনি 'সুওয়োম হুজুর' বা তৃতীয় উস্তাদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন)। তিনি লোকদেখানো লৌকিকতামুক্ত অত্যন্ত সাদাসিধে একজন উস্তাদ ছিলেন। মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) তাঁর কাছে ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাব "হেদায়া"র চতুর্থ খণ্ডের দরস গ্রহণ করেন।

ছাত্রের প্রখর মেধা এবং উস্তাদের বিনয়ের এক অদ্ভুত বিষয় ছিল যে, উস্তাদ হযরত মাওলানা আবু হাসান (রহ.) দরস দেওয়ার সময় কোনো জটিল বা কঠিন মাসআলার সম্মুখীন হলে তাঁর মেধাবী শাগরিদ 'ফয়জুল্লাহ'র দিকে তাকাতেন এবং তলাবাদের সামনেই মাসআলাটি নিয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ ও মুজাকারা করতেন; তারপর দরস সামনে বাড়াতেন।

হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন:
"উস্তাদ মহোদয়ের এই পদ্ধতির কারণে আমার জন্য এটি আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, দরসের হালকায় যাওয়ার আগে আগামী দরসের কিতাব অত্যন্ত নিখুঁত ও গভীরভাবে মুতালাআ করে প্রস্তুতি নিয়ে যাওয়া।"

ইলম অর্জনের এই কঠোর ও আন্তরিক তরবিয়তের বরকতে, হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর সারাজীবনে "হেদায়া" কিতাবটি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বাধিক মুতালাআর কিতাব হয়ে ছিল। এর মাসায়েল এবং যৌক্তিক ও শরিয়তের দলিলগুলো (আকলি ও নকলি দালাইল) তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ ও নখদর্পণে ছিল।

হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) এমন এক উচ্চ ইলমি মাকামে পৌঁছেছিলেন যে, তাঁর আসাতেযায়ে কেরাম এবং বড় বড় আকাবিরগণ তাঁকে বড়দের কাতারে গণ্য করতেন। জামিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ কুরাইশী (রহ.) তাঁর সম্পর্কে বলতেন:

"ফয়জুল্লাহ যদিও আমাদের শাগরিদ, কিন্তু ইলমি মাকাম ও যোগ্যতার দিক থেকে সে আমাদের আসাতেযায়ে কেরামের সমতুল্য।"

সে সময় জামিয়া হাটহাজারীর ওলামায়ে কেরামের যে সোনালী প্রজন্ম ছিলেন—যেমন হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ কুরাইশী, শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা যমীরুদ্দীন এবং মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ (রাহিমাহুমুল্লাহ)—তাঁরা উস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও কোনো জটিল ফিকহি মাসআলায় ইখতিলাফ হলে কিংবা কোনো ইলমি ইশকাল (সংশয়) দেখা দিলে, চূড়ান্ত ফয়সালা ও সমাধানের জন্য এই শাগরিদের কাছেই ছুটে আসতেন।

এমনকি জামিয়ার শায়খুল হাদীস, আল্লামা সাঈদ আহমদ (রহ.) কিতাব মুতালাআ করার সময় কোনো কঠিন মাসআলার সম্মুখীন হলে, কিতাব হাতে নিয়ে নিজেই তাঁর শাগরিদ 'ফয়জুল্লাহ'-এর কামরায় চলে আসতেন মুজাকারা করার জন্য। হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)-ও তাঁর উস্তাদকে চরম আদব ও সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মাসআলার সমস্ত জটিলতা ভেঙে বুঝিয়ে দিতেন।

আল্লাহ তাআলা হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)-কে একদম অল্প বয়স থেকেই লিখনী ও কিতাব রচনার এক বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন। ছাত্র যামানাতেই তিনি একজন মুসান্নিফ হয়ে উঠেছিলেন, পাশাপাশি তিনি একজন স্বভাবজাত ফার্সি কবিও ছিলেন, যাঁর জবান থেকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে কবিতা নিঃসৃত হতো।

তিনি যখন (ফারসি সাহিত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ কিতাব) **"গুলিস্তাঁ"** পড়ছিলেন, তখনই তিনি ফারসি ভাষায় উপদেশমূলক একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম দেন **"পান্দে ফয়জ"** (ফয়জের উপদেশমালা) । এটি তিনি হযরত শেখ মুসলেহুদ্দীন সাদী শিরাজী (রহ.)-এর বিখ্যাত কিতাব "কারীমা"-এর বহর ও ছন্দের অনুকরণে লিখেছিলেন।

তাঁর এই প্রাথমিক জীবনের লিখনী কেবল সাহিত্য ও কবিতার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি মা'কুলাত বা যুক্তিবিদ্যার গভীর ইলমের ভেতরেও প্রবেশ করেছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি যখন যুক্তিশাস্ত্রের কঠিন কিতাব **"সুল্লামুল**

উলূম" পড়ছিলেন, তখন তিনি ফারসি ভাষায় এমন কিছু রেসালা (পুস্তিকা) ও শরাহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) রচনা করেন, যাতে منطق বা যুক্তিবিদ্যার সবচেয়ে কঠিন ও জটিল অধ্যায়—যেমন: 'আকসে মুস্তাবী', 'আকসে নাকীয' এবং 'তানাকুয'—এর আলোচ্য বিষয়গুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে হল (ব্যাখ্যা) করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে সফর করার সময় তাঁর অনুপস্থিতিতে মেখলের নিজ বাড়িতে এই মূল্যবান শরাহ ও রেসালাগুলো হারিয়ে যায়।

যখন হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর বয়স একুশ বছর হলো, তখন তিনি উচ্চশিক্ষা হাসিল করার জন্য ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্দেশ্যে সফর করেন। সেখানে তিনি সমকালীন বড় বড় আকাবির ও যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছ থেকে ইলমের সুধা পান করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী, বড় মুহাদ্দিস ও মুফতি হযরত মাওলানা আজীজুর রহমান উসমানী, ইমামুল আসর হযরত শাহ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, আদীবুল ইসলাম হযরত মাওলানা এজাজ আলী এবং মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রাহিমাহুমুল্লাহ)।

হিজরি ১৩৩১ সালের কাছাকাছি সময়ে দেওবন্দে তাঁর প্রথম পৌঁছানোর দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) বলেন:

"যখন আমি দারুল উলূম দেওবন্দে পৌঁছলাম, তখন সাময়িকভাবে (ভর্তি হওয়ার আগে) আমাদের বড় ভাই হযরত মাওলানা জাকের চাটগামী (রহ.)-এর কামরায় উঠলাম। একদিন আসরের নামাজের পর আমি কামরায় বসে বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র)-র অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিতাব **'মুখতাসারুল মাআনী'** মুতালাআ করছিলাম। যুক্তিবিদ্যা ও বালাগাত শাস্ত্রের তৎকালীন বিখ্যাত উস্তাদ হযরত মাওলানা রসূল খাঁ (রহ.) আমাদের কামরার ঠিক উপরের একটি কামরায় থাকতেন। উস্তাদ মহোদয় কোনো প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় আমাকে দেখতে পেয়ে কামরায় তাশরীফ আনলেন এবং আমার খোঁজখবর নিলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন: তোমার সামনে যে 'মুখতাসারুল মাআনী' কিতাবটি রয়েছে, সেখান থেকে কিছুটা ইবারত পড়ে আমাকে শোনাও।"

হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) বলেন:

"আমি কিতাব থেকে সামান্য ইবারত পড়ে যখন তাঁর সামনে সেটির শরাহ বা ব্যাখ্যা করলাম, তখন উস্তাদ মহোদয় অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আমার মেধা এবং সুন্দর ইবারত পাঠ দেখে তাঁর চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আমাকে অত্যন্ত উৎসাহ দিয়ে এবং সুসংবাদ শুনিয়ে বললেন—'তোমাকে এই দেওবন্দেই পড়াশোনা করতে হবে, অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না। ইনশাআল্লাহ, তুমি যখন তোমার দেশ বাংলায় ফিরে যাবে, তখন তুমি সেখানকার সবচেয়ে বড় আলেম হয়ে ফিরবে।'"

হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) দেওবন্দের ছাত্রজীবনের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে বলেন:

"আমার স্পষ্ট মনে আছে, আরবি সাহিত্যের অনন্য কিতাব 'মাকামাতে হারিরী' পড়ার সময় দরসের বেঞ্চে সহপাঠী হিসেবে আমার সাথে ছিলেন হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.)।"

উল্লেখ্য যে, হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) (যিনি ১৩১৪ হিজরিতে ভারতের দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন) পরবর্তীতে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতি (মুফতিয়ে আজম) পদের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন এবং পুরো উপমহাদেশে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেন। দেশভাগের পর তিনি পাকিস্তানে হিজরত করেন এবং সেখানে **"মুফতি-এ-আজম পাকিস্তান"** উপাধিতে ভূষিত হন।

এখানে মহান আল্লাহর এক অপূর্ব কুদরত এবং গায়েবি মিল লক্ষ করা যায়; ইসলামের আকাশের এই দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র ও মহান মনীষী একই দিনে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন!

তাঁদের ওফাত বা ইন্তেকাল হয়েছিল বুধবার, ১২ই শাওয়াল। বাংলাদেশের সময় সকাল ১১:৫৫ মিনিটে মুফতি-এ-আজম হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ (রহ.) আল্লাহর রহমতের দিকে চলে যান (ইন্তেকাল করেন)। আর ঠিক সেই একই দিনের দিবাগত রাতে পাকিস্তানের সময় রাত ১২:০০ টায় তাঁর দরসের সাথী মুফতি-এ-আজম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফী (রহ.)-ও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। এভাবে দারুল উলূম দেওবন্দের দুই শ্রেষ্ঠ সন্তান একই দিনে মুসলিম উম্মাহকে এতিম করে চলে যান, যাঁদের ওফাতের মাঝে সময়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ১২ ঘন্টা।

হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) মাদরাসার ছুটির দিনগুলোকেও বৃথা নষ্ট করতেন না। ছুটির সময়ে তিনি তাঁর সহপাঠী ও ছোট তলাবাদের দরস দিতেন এবং একদম অল্প বয়স থেকেই কিতাব লেখালেখির কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি নিজেই স্মৃতির ছলে বলতেন যে, ছাত্রজীবনে তাঁর এমন কোনো ছুটির সময় কাটেনি, যে ছুটিতে তিনি দ্বীনি কোনো বিষয়ের ওপর একটি ইলমি পুস্তিকা তাসনীফ বা রচনা করেননি। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই ইলম অর্জন এবং লিখনীর প্রতি তাঁর কতটা গভীর ইশক ও অনুরাগ ছিল।

হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর ঐতিহাসিক সাক্ষ্য:

দারুল উলূম দেওবন্দে ছাত্র থাকাকালীন হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর ইলমি শ্রেষ্ঠত্ব ও অনন্য মেধার এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। একবার যুক্তিবিদ্যার অত্যন্ত জটিল কিতাব **"মুল্লা হাসান"**-এর পরীক্ষা চলছিল; যার পরীক্ষক ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)।

যখন আল্লামা উসমানী (রহ.) ছাত্র 'ফয়জুল্লাহ চাটগামী'-এর পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করছিলেন, তখন তাঁর সূক্ষ্ম ও গভীর বুঝজ্ঞান এবং অসাধারণ ইবারত হল (ব্যাখ্যা) করার যোগ্যতা দেখে তিনি একদম বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে যান। খাতা দেখে তিনি তাঁর সেই ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন:

"মনে হচ্ছে, এই ছাত্রটি কিতাবের লেখকের চেয়েও কিতাবটি আরও উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছে! আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে এই ছাত্রটিকে এক নজর দেখার এবং তার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য।"

হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর উস্তাদ হযরত মাওলানা আব্দুস সমী (রহ.) তাঁকে এই সুসংবাদটি পৌঁছে দিয়েছিলেন। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর মতো অতবড় একজন যুগশ্রেষ্ঠ আকাবিরের মুখ থেকে এমন ঐতিহাসিক প্রশংসা শোনার পর সহপাঠী ও অন্য তলাবাদের মাঝে এক ঈর্ষণীয় আনন্দের সৃষ্টি হয়েছিল এবং অল্প বয়সেই সবার মাঝে তাঁর ইলমি মাকাম ও গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

৩. দ্বীনি ও ইলমি খিদমতের মজলিস:

সফল শিক্ষক ও মুফতি: হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ (রহ.) এক গৌরবোজ্জ্বল ও সফল শিক্ষাজীবন শেষ করে ১৩৩৪ হিজরিতে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। সে সময়ের কথা স্মরণ করে হযরত অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তিনি তাঁর সকল আসাতেযায়ে কেরাম ও সহপাঠীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং পুরো ছাত্রজীবনে কখনো কারো সাথে কোনো ঝগড়া-বিবাদে জড়াননি। প্রায় প্রতি বছরই পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন।

নিজের মাতৃসম মাদরাসার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের কথা ব্যক্ত করে হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন:

"জামিয়া হাটহাজারী হলো আমার ইলমি মা। আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া যে, দেওবন্দ থেকে ফিরে আসার পরপরই আমার শ্রদ্ধেয় আসাতেযায়ে কেরামের পরামর্শ ও নির্দেশনায় আমি এই জামিয়াতেই শিক্ষক ও মুদাররিস হিসেবে নিযুক্ত হই। মুদাররিস হিসেবে খিদমত শুরু করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমার ওপর ইফতা ও ফতোয়া জারির মহান দায়িত্বও অর্পণ করা হয়।"

ভারত থেকে ফিরে আসার পর তাঁর ইলমি সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন জায়গা থেকে বড় বড় চাকুরির প্রস্তাব আসতে থাকে। তৎকালীন সরকারি মাদরাসাগুলোতে—যার মধ্যে অন্যতম ছিল "সরকারি মহসিনীয়া মাদরাসা" চট্টগ্রাম যা এখন মুহসিনিয়া কলেজ হিসেবে পরিচিত—অত্যধিক বেতনের আকর্ষণীয় অফার নিয়ে সরকারি কর্মকর্তারা তাঁকে চাকুরিতে যোগ দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করতে থাকেন।

কিন্তু হযরত (রহ.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সেই সমস্ত লোভনীয় সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ওজর পেশ করেন। তিনি মনে করতেন, সরকারি চাকুরি এবং মোটা অঙ্কের বেতনের পেছনে পড়ে যাওয়া মানেই হলো "ইলমের মৃত্যু" এবং দ্বীনের স্বাধীন খিদমতের মহৎ মিশন বিলুপ্ত হওয়া। তাই তিনি নিজের কওমি মাদরাসা (জামিয়া হাটহাজারী)-তেই থেকে যাওয়াকে প্রাধান্য দিলেন, যাতে উম্মতের নতুন প্রজন্মকে ইখলাস, যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) এবং তাওয়াক্কুলের (আল্লাহর ওপর ভরসা) ওপর গড়ে তুলতে পারেন।

হযরত মাওলানা 'খতীবে আজম (রহ.)'-এর ঐতিহাসিক সাক্ষ্য: হযরতের অন্যতম প্রধান শাগরিদ, আল্লামা সিদ্দিক আহমদ (যিনি 'খতীবে আজম বাংলাদেশ' নামে সমধিক পরিচিত) তাঁর উস্তাদ মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর ইলমি গভীরতা ও যোগ্যতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন:

"আমরা যখন জামিয়া হাটহাজারীতে হযরতের কাছে কোনো কিতাবের দরস নিতাম, তখন প্রতিটি মাসআলার ব্যাখ্যায় তাঁর মাঝে এক অদ্ভুত শক্তি ও গভীরতা দেখতে পেতাম। তিনি ইলমি মাসআলাগুলোর একদম গভীরে ডুব দিতেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তা ও আস্থার সাথে সমাধান পেশ করতেন। কোনো ইশকাল বা জটিল মাসআলার সমাধান দিতে গিয়ে আমরা কখনোই তাঁকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতে দেখিনি।"

খতীবে আজম (রহ.) আরও একটি বিস্ময়কর তথ্য দিয়ে বলেন, হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) যুক্তিশাস্ত্রের অন্যতম কঠিন কিতাব **"হামদুল্লাহ"** অত্যন্ত দক্ষতা ও নিখুঁতভাবে দরস দিয়েছেন; অথচ এই কিতাবটি তিনি নিজে কোনো

উস্তাদের কাছে পড়েননি! বরং নিজস্ব গভীর মুতালাআর মাধ্যমে নিজেই কিতাবটি হল করেছেন এবং ছাত্রদের সামনে কোনো প্রকার সংশয় ছাড়াই এর দরস আঞ্জাম দিয়েছেন।

একটি ইনসাফপূর্ণ ইলমি তুলনা: নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) বলেন:

"হাটহাজারীতে পড়াশোনা শেষ করার পর আমি ভারতের সাহারানপুর এবং পরবর্তীতে দারুল উলূম দেওবন্দে সফর করি। সেখানেও আমি যুগশ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের কাছে উচ্চতর ফুনুনাত (منطق বা যুক্তিবিদ্যা এবং ফালসাফা বা দর্শন)-এর কিতাবসমূহের দরস গ্রহণ করি; যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.)। আমার স্বরণ আছে, আমি হযরতকে বেশ কিছু জায়গায় প্রশ্ন (ইশকাল) করেছিলাম। কোন অতিরঞ্জন ছাড়াই এক্ষেত্রে আমার পর্যবেক্ষণ হলো, আমাদের শায়খ ও উস্তাদ মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহ)-কে যেমন দ্বিধাহীন ও সুদৃঢ় আলোচনার মাধ্যমে ফুনূনাতে আলিয়ার জটিলতাগুলো হল করতে দেখেছি মুফতী শফী (রহ.)-কেও আমরা ওই স্তরে পাইনি। "

৪. ঘরসংসার ও পারিবারিক শিক্ষা পরিচালনা

হযরত মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী (হাফিজাহুল্লাহ) তাঁর স্ত্রীর নানীর কাছ থেকে (যিনি স্বয়ং হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ.-এর আহলিয়া বা স্ত্রী ছিলেন) হযরতের পারিবারিক আখলাক ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে একটি জীবন্ত ও তথ্যবহুল বিবরণ নকল করেছেন, যা নিচে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হলো:

মুতালাআর প্রতি গভীর ইশক: আল্লাহ তাআলা হযরতকে কিতাব মুতালাআ করার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ধৈর্য ও গভীর অনুরাগ দান করেছিলেন; তিনি তাঁর যিন্দেগীর একটি মিনিট সময়ও বৃথা নষ্ট করতেন না। এমনকি যখন তিনি দস্তরখানে খাবার আসার অপেক্ষায় বসে থাকতেন, তখনও হাতে কিতাব নিয়ে মুতালাআ করতেন। খাবার শেষ হওয়া মাত্রই আবার কিতাবের সাগরে ডুব দিতেন; মনে হতো মুতালাআ করাই যেন তাঁর জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস।

পারিবারিক কাজে সাহায্য: সুন্নাতে নববীর নিখুঁত অনুসরণে হযরত ঘরের ভেতরে অত্যন্ত বিনয়ী জীবনযাপন করতেন। তিনি ঘরের বিভিন্ন কাজে তাঁর আহলিয়াকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। তিনি হাদীসে বর্ণিত " كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ" (তিনি ঘরের মানুষের কাজে সহযোগিতা করতেন)—এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন: হযরতের পুরো জীবন ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং পরিপাটি। ঘরের প্রতিটি জিনিস নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখার ব্যাপারে তিনি ভীষণ যত্নবান ছিলেন। তাঁর এই স্থায়ী পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস ঘর এবং তাঁর বাহ্যিক অবয়বে এক অনন্য সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য ও সুরুচির ছাপ ফুটিয়ে তুলত।

নামাজের প্রতি ইহতিমাম: হযরতের জীবনটা যেন ছিল এক নামাজ থেকে আরেক নামাজের মধ্যবর্তী সময়। মুআযযিনের আযান শোনার সাথে সাথেই তিনি তাঁর কিতাব ও মুতালাআ বন্ধ করে দিতেন এবং ব্যাকুল হৃদয়ে মসজিদের দিকে ছুটে যেতেন, যেন সর্বদা প্রথম সফে (তাকবীরে উলার সাথে) নামাজ আদায় করতে পারেন।

কানাআত বা অল্পে তুষ্টি: তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে ও অল্পে তুষ্ট ছিলেন। নিজের আহলিয়াকে সর্বদা অসিয়ত করে বলতেন, "আমার খাবারের পেছনে বাড়তি সময় নষ্ট করো না এবং হরেক পদের খাবারের আয়োজন করে কষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই।" তিনি দামি বা রাজকীয় খাবারের চেয়ে সাধারণ শাকসবজি খাওয়া বেশি পছন্দ করতেন।

ইসরাফ বা অপচয় বর্জন: তিনি যেকোনো ধরনের অপচয় ভীষণ অপছন্দ করতেন। ওজু এবং গোসলের সময় তিনি অপচয় না করে অত্যন্ত কম পানি ব্যবহার করতেন। হায়া ও পর্দার বিষয়ে তিনি এতটাই সংবেদনশীল ছিলেন যে, সম্পূর্ণ ঘেরাও করা আবৃত গোসলখানা ছাড়া কখনো গোসল করতেন না।

দুনিয়াবিমুখতা ও দ্বীনি গায়রাত (অভাব-অনটনে ধৈর্য): দুনিয়াবি আসবাবপত্রের কোনো কিছু নষ্ট হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে—তা যতই মূল্যবান হোক না কেন—তিনি কখনো আফসোস বা ক্ষোভ প্রকাশ করতেন না এবং পার্থিব কোনো বিষয়ের জন্য রাগ করতেন না। কিন্তু দ্বীনের কোনো হুকুম পালনে সামান্য অবহেলা বা ত্রুটি দেখলে আল্লাহ তাআলার শরিয়তের প্রতি গভীর গায়রাত ও মহব্বতের কারণে তাঁর অন্তর চিন্তা ও ক্ষোভে ফেটে পড়ত।

পর্দার প্রতি কঠোরতা: ঘরের লোকজনের পর্দার ব্যাপারে হযরতের মাঝে প্রচণ্ড গায়রাত (সম্মানবোধ) ছিল। তিনি তাঁর আহলিয়া এবং কন্যাদেরকে শরয়ি হিজাব ও পূর্ণ পর্দার বিধান মেনে চলার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ও তাগিদপূর্ণ নির্দেশনা দিতেন।

যিন্দেগীর প্রথম ভাগে তিনি বাজারের প্রয়োজনীয় সওদাপাতি নিজের হাতেই করতেন (পরবর্তীতে তাঁর বড় জামাতা এই দায়িত্বটি নিজের কাঁধে তুলে নেন)। তবে তাঁর এই খিদমত শুধু নিজের ঘরের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং প্রতিবেশীরাও অনেক সময় বাজার থেকে কোনো জিনিসপত্র এনে দেওয়ার অনুরোধ করত। হযরত অত্যন্ত খোশদিলে এবং হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে পৌঁছে দিতেন, এতে কখনো তাঁর মাঝে কোনো ক্লান্তি বা অহংকারের ভাব প্রকাশ পেত না।

তিনি ঘরের লোকজনের প্রতি অত্যন্ত কোমল ও দয়াবান ছিলেন। নারীদের আরাম-আয়েশের দিকে খেয়াল রাখতেন এবং ঘরে প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র ও সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন যাতে ঘরের মা-বোনদের ওপর অতিরিক্ত কোনো কষ্ট না হয় এবং তাঁরা যেন অত্যন্ত স্বস্তি ও প্রশান্তির সাথে যিন্দেগী কাটাতে পারেন।

হযরত সুন্নাতে নববীর ওপর পুরোপুরি আমল করতেন; খাবারে কখনো কোনো খুঁত বা দোষ ধরতেন না এবং প্রশংসার ক্ষেত্রেও অতিরঞ্জন কিংবা নিন্দা করতেন না। কখনো যদি ঘরের মহিলারা খাবার তৈরিতে কোনো ভুল বা ত্রুটি করতেন, তবে তিনি তাদের দিল খুশি করার জন্য সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন: "কোনো সমস্যা নেই, খাবার সুস্বাদু হয়েছে।" এভাবে তিনি তাদের ভুলত্রুটি ঢেকে রাখতেন এবং মন রক্ষা করতেন।

হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর উস্তাদ ও মুরব্বী হিসেবে ভূমিকা কেবল জামিয়ার তলাবাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি তাঁর ঘরের ভেতরও একটি ইলমি পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি নিজের যত্নে তাঁর দুই কন্যা—রহীমা খাতুন ও যয়নব-কে আরবি ভাষা এবং কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শিক্ষা প্রদান করেন।

হযরত (রহ.) তাঁর বড় মেয়ে 'রহীমা'-র মেধার ওপর বেশ গর্ব করতেন এবং বলতেন:

"আমার এই মেয়েটি অত্যন্ত জহীন (মেধাবী) এবং তাঁর হেফজ শক্তি (স্মরণশক্তি) প্রখর। কিতাবের ইলমি মাসআলাগুলো যতই জটিল ও কঠিন হোক না কেন, সে তা সহজেই আয়ত্ত করতে পারে এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও পরিপাটি করে তা আলোচনা করতে পারে।"

কন্যার ইলম ও প্রজ্ঞার ওপর গভীর আস্থা থাকার কারণে হযরত অনেক জটিল ও সূক্ষ্ম ইলমি কাজে তাঁর সাহায্য নিতেন। তিনি মাঝেমধ্যে মেয়েকে ফতোয়া লিপিবদ্ধ ও সাজানোর দায়িত্ব দিতেন। এমনকি মিরাসের (উত্তরাধিকার আইন) কঠিন ও জটিল মাসায়েলগুলো সমাধানের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর ওপর ভরসা করতেন এবং বলতেন: "মাশাআল্লাহ, ইলমুল ফারায়েয (মিরাস শাস্ত্র)-এ তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতা অতুলনীয়।"

আর তাঁর ছোট মেয়ে 'যয়নব'-এর কারণেই মূলত হযরতের আরবি ভাষা শিক্ষার কিতাব "তালীমুল মুবতাদী আল লিসানাল আরাবী" তাসনীফ হয়েছিল। এই কিতাব সম্পর্কে হযরত নিজেই বলেন:
"প্রকৃতপক্ষে, আমি এই কিতাবটি বিশেষভাবে আমার ছোট মেয়ে 'যয়নব'-কে শেখানোর জন্যই রচনা করেছিলাম। তাকে আরবি সাহিত্যের সাথে জুড়ে দেওয়া এবং আমি যে নাহু-সরফ (ব্যাকরণ) তাকে পড়িয়েছি, তা কীভাবে ইবারতে প্রয়োগ করতে হয়—তা মশক (অনুশীলন) করানোর জন্য আমি প্রতিদিন কিছু কিছু আরবি বাক্য ও ইবারত লিখে দিতাম। দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এই দরসগুলোই জমা হয়ে পরবর্তীতে একটি স্বতন্ত্র কিতাবের রূপ নেয়, যা দ্বারা এখন সাধারণ তলাবারা উপকৃত হচ্ছে।"

বড় মেয়ে শেখ রহীমা খাতুন ঘরের ভেতরের সেই অনন্য ইলমি সফরের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন:
"আমি যখন দশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই উস্তাদ হযরত মাওলানা আজীজুল্লাহ (রহ.)-এর কাছে নাহু ও সরফের প্রাথমিক কিতাবসমূহ পড়ি। এতে ইলম অর্জনের প্রতি আমার শখ ও মহব্বত আরও বেড়ে যায়। আমার আব্বাজান (মুফতি ফয়জুল্লাহ রহ.)-এর তীব্র তামান্না (ইচ্ছা) ছিল যে তিনি আমাকে পুরো নেসাবে তালীম নিজেই পড়াবেন। আমি যখন একটু বড় হলাম এবং উস্তাদের সামনে গিয়ে বসার ক্ষেত্রে লজ্জা অনুভব করতে লাগলাম, তখন আব্বাজান নিজেই নিয়মিত আমার দরসের যিম্মাদারী নিলেন। তিনি আমার পড়ার জন্য একটি নিখুঁত রুটিন তৈরি করে দিলেন, যা দৈনিক তিন বেলা বিভক্ত ছিল: ফজর নামাজের পর, যোহর নামাজের পর এবং রাতে।"

তিনি তাঁর আব্বাজানের কাছে যে সমস্ত কিতাব পড়েছেন, সেগুলোর বিবরণ দিয়ে আরও বলেন:
"আমি আব্বাজানের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি ও সাহিত্যিক কিতাবসমূহ পড়েছি। তিনি আমার তালীম শুরু করেছিলেন ফারসি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কিতাব 'কারীমা' ও 'গুলিস্তাঁ' ইত্যাদি দিয়ে। এরপর আরবি ভাষায় ভালো যোগ্যতা অর্জনের জন্য ফারসি কিতাবের পাশাপাশি উচ্চমানের সাহিত্য ও তরবিয়তি কিতাব পড়ান, যেমন: 'মুফীদুল তালেবীন', 'তালীমুল মুতাআল্লিম', 'কালয়ূবী', 'কাসীদায়ে বুরদাহ' ও 'নাফহাতুল আরব'। এর সাথে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)-এর বিখ্যাত কিতাব **'আল-ফুরকান** বাইনা আওলিয়াইর রাহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান'-ও পড়িয়েছেন।"

"ফিকহ শাস্ত্রে আমি তাঁর কাছে 'মালা বুদ্দা মিনহু' এবং 'মুখতাসারুল কুদুরী' পড়েছি। এছাড়াও তিনি তাঁর নিজের লেখা একটি কিতাবও আমাকে পড়িয়েছেন, যা আরবি ও ফারসি ভাষায় শরয়ি ফতোয়ার সংকলন—যার নাম ছিল **'ফাতাওয়ায়ে লা বুদ্দিয়াহ'**।"

মুহতারমা রহীমা খাতুন সেই সোনালী মারহালার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন:
"যখন আমি তেরো বছর বয়সে পদার্পণ করলাম এবং মহান আল্লাহর মেহেরবানিতে আরবি ভাষা ও আদবের ওপর আমার একটি মজবুত যোগ্যতা তৈরি হলো, তখন আব্বাজান (রহ.) আমাকে ফিকহের সুবিখ্যাত কিতাব **'হেদায়া'**-র দরস দেওয়া শুরু করলেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার ওপর তাঁর অসীম দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন; তিনি আমার অন্তরে ইলম অর্জনের প্রতি এবং কিতাব মুতালাআর প্রতি এক গভীর মহব্বত ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর লাখো শোকর, আমি দিন-রাত কিতাব অধ্যয়ন ও দরসের মাঝে ডুবে থাকতাম। মুতালাআর প্রতি আমার প্রবল আকর্ষণের কারণে আমি রাতে আব্বাজানের অলক্ষ্যে একটি বুদ্ধি খাটাতাম; আমি একটি কাগজ দিয়ে হারিকেনের চারপাশ ঢেকে দিতাম—যাতে এর আলোর তীব্রতা কমে যায় এবং কেউ আমার জেগে থাকার বিষয়টি টের না পায়। এভাবে গভীর অনুরাগ ও তৃপ্তি সহকারে গভীর রাত পর্যন্ত কিতাব মুতালাআ করতাম, এরপর ঘুমাতাম।

যখন আমি 'হেদায়া' কিতাবের দরস শুরু করলাম, তখন দিন দিন একেকটি দরস করে খুব দ্রুত কিতাবটি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমি হেদায়ার প্রথম দুই খণ্ডের (আউয়ালাইন) দরস শেষ করে ফেললাম।

তখন আব্বাজান (রহ.) পুনরায় প্রথম থেকে আমাকে 'হেদায়া' কিতাবটির দরস দেওয়া শুরু করলেন এবং এর সাথে হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব **'মিশকাত'**-এর দরসও জুড়ে দিলেন। তিনি আমাকে 'মিশকাতুল মাসাবীহ' কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হরফ বাই হরফ (খুব নিখুঁতভাবে) পড়ালেন। এর সাথে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.)-এর লেখা মিশকাতের অত্যন্ত মূল্যবান ও বিখ্যাত ফারসি শরাহ **'আশিয়াতুল লামাআত'**-এর চারটি খণ্ডও সম্পূর্ণ শেষ করালেন।

যখন 'আশিয়াতুল লামাআত' শরাহসহ 'মিশকাত' কিতাবের দরস সমাপ্তির কাছাকাছি পৌঁছাল, তখন আমার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর। একবার পূর্ণ মিশকাত শরীফ পড়ার পর আব্বাজান দ্বিতীয়বারের মতো আবার আমাকে মিশকাতের দরস দিলেন এবং এবার এর সাথে **'তাফসীরে জালালাইন'**-এর দরস শুরু করলেন। পাশাপাশি হেদায়া কিতাবের বাকি থাকা শেষ দুই খণ্ডও (সালেস ও রাবে) আমাকে পড়াতে লাগলেন। সেই বছরই (অর্থাৎ চৌদ্দ বছর বয়সেই) আমার আকদ ও বিবাহ সম্পন্ন হয়। মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া যে, বিয়ের আগেই আমি ইলমি যিন্দেগীর এই সমস্ত মহান ও যুগান্তকারী কিতাবসমূহের দরস সমাপন করতে পেরেছিলাম।

আলহামদুলিল্লাহ, বিয়ের পরেও আমার তালীম ও পড়াশোনা বন্ধ হয়নি; পরবর্তীতে আমি আব্বাজানের কাছে মিরাস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব **'সিরাজী'** এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর সংকলিত বিখ্যাত হাদীসের কিতাব **'মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ'** পড়েছি। তখন আমার সাথে আমার ছেলে হুসাইনও দরসে শরীক ছিলো।

অন্যদিকে, আমার ছোট বোন 'যয়নব' শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আজীজুল্লাহ (রহ.)-এর কাছে নাহু ও সরফের প্রাথমিক কিতাবসমূহ পড়া শুরু করে। এরপর সে আব্বাজান (রহ.)-এর কাছে 'তালীমুল মুবতাদী, তরজমাতুল কুরআন, 'ফয়জুল কালাম' ও 'হেদায়াতুল ইবাদ'সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে।

ঠিক ওই সময়েই আব্বাজান আমাদের দুই বোনকে—আমাকে এবং বোন যয়নবকে—একসাথে বসিয়ে পবিত্র কুরআনের তরজমা শেখানো শুরু করেন। তিনি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় তাফসীরসহ আল্লাহর কিতাবের পূর্ণ তরজমার দরস আমাদের শেষ করান। ঘরের কিছু সাংসারিক ব্যস্ততার কারণে মাঝেমধ্যে আমার দরস অনুপস্থিতি হতো, কিন্তু আমার ছোট বোন যয়নব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে পবিত্র কুরআনের তরজমার দরসে হাজির থাকত; তাঁর একটি দিনও কুরআন তরজমার দরস ছুটে যায়নি।"

এখানে আরও একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো, হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) তাঁর দুই কন্যাকে শরিয়তের উচ্চতর ইলম এবং আরবি ভাষা শেখানোর ব্যাপারে অত্যন্ত সচেষ্ট থাকা সত্ত্বেও—এই তালীম ও পড়াশোনাকে তাঁদের বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো অজুহাত বা বাধা হতে দেননি; বরং সুন্নাতে নববীর অনুসরণ এবং হালাল পথকে সহজ করার লক্ষ্যে তিনি অল্প বয়সেই তাঁদের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

তাওরাতে লিখিত রয়েছে: "যার কন্যা বারো বছরে পদার্পণ করল, অথচ সে তার বিবাহের ব্যবস্থা করল না এবং এরপর সেই কন্যা কোনো গুনাহে লিপ্ত হলো, তবে সেই গুনাহের দায়ভার তার পিতার ওপর বর্তাবে।" *(বায়হাকী, শুআবুল ঈমান)*

তিনি তাঁর বড় কন্যাকে চৌদ্দ বছর বয়সে এবং ছোট কন্যাকে ষোলো বা সতেরো বছর বয়সে—চরম পবিত্রতা ও কলঙ্কমুক্ত হালতে—বিবাহ দেন। তাঁদের বিদায় ও রুখসতী অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ শরয়ি তরিকায়, অত্যন্ত সাদাসিধে ও লৌকিকতামুক্ত অবস্থায় সুন্নাত মোতাবেক সম্পন্ন হয়েছিল; যেখানে উভয় কন্যার মোহরানা "মহরে ফাতেমী" অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছিল।

উভয় কন্যার বিবাহ ও বৈবাহিক সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণের মাঝে অনেক বড় বড় শিক্ষণীয় দিক ও নসীহত রয়েছে, তবে আমরা এখানে লেখার কলেবর সংক্ষেপ করার জন্য এবং মূল জীবনীর ওপর আলোকপাত করার সুবিধার্থে সেই অংশটুকু এড়িয়ে গেলাম।

৫. ফকীহগণের জন্য উত্তম আদর্শ এবং পরহেজগারদের উজ্জ্বল নক্ষত্র:

এক ব্যতিক্রমী পরিবেশে বিজ্ঞ মুজাদ্দিদ: হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) কেবল দরস-তাদরীসের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকা কোনো গতানুগতিক আলেম ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন তৎকালীন বাংলা অঞ্চলের কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া এক বৈপ্লবিক সংস্কারমূলক চিন্তাধারার ব্যতিক্রমী আলেম। তাঁর বিভিন্ন সাহসী পদক্ষেপ ও রেসালাসমূহের গভীরতা নিয়ে যিনিই চিন্তা করবেন, তিনি তাঁর মাঝে ওই সমস্ত মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকদের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাবেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা প্রতি শতাব্দীর শুরুতে উম্মতের দ্বীনকে সংস্কার ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য পাঠান। মহান আল্লাহ তাআলা তাঁকে ‘নবীগণের প্রকৃত ওয়ারিশ’ হিসেবে কবুল করেছিলেন, যিনি সম্পূর্ণ সাহসিকতা ও মৌলিকতার সাথে সমাজে জেঁকে বসা অনৈসলামিক রীতিনীতি ও ভুল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সে সময়ে অনেক ওলামায়ে কেরাম—অসতর্কতাবশত কিংবা উদাসীনতার কারণে—কওমি মাদরাসাগুলোর বাগানের ফলমূল এবং মাদরাসার পুকুরের মাছ ব্যক্তিগতভাবে খাওয়া ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করতেন। হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.) এই বিষয়ে শক্ত অবস্থান নেন। তিনি এই ধরণের শিথিলতাকে হারাম আখ্যা দিয়ে এবং ওয়াকফিয়া মালের সূক্ষ্ম শরয়ি হুকুমসমূহ বয়ান করে কঠোর ফতোয়া জারি করেন। এর ফলে ওলামা মহলের মাঝে এক ব্যাপক সচেতনতা ও তাকওয়া-পরহেজগারির পরিবেশ তৈরি হয় এবং দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোর পবিত্রতা রক্ষা পায়।

হযরত (রহ.) তাঁর তীক্ষ্ণ ইলমি দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তৎকালীন সময়ে কওমি মাদরাসাগুলোর জন্য চান্দা বা সাহায্য সংগ্রহের যে পদ্ধতি চালু ছিল—যা মূলত মানুষের (ভালো-মন্দ সবার) দ্বারে দ্বারে ঘুরে এক প্রকার ভিক্ষাবৃত্তির মতো হাত পেতে চান্দা তোলার ওপর নির্ভরশীল ছিল—তা যদিও মাদরাসার উপকারের নিয়তে এবং নেক মাকসদে করা হতো, কিন্তু এর দ্বারা ওলামায়ে কেরামের শান-শওকত ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতো এবং সাধারণ মানুষের অন্তর থেকে আদর্শ ও স্বাধীনচেতা আলেম হিসেবে তাঁদের যে শ্রদ্ধা ও মাকাম ছিল তা হারিয়ে যেত। উপরন্তু, ভবিষ্যতে দ্বীনের নামে এটি একটি অবৈধ উপার্জনের রাস্তা খুলে দিতে পারত।

তাই তিনি কেবল মুখে এর ইনকার করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রবন্ধ ও কিতাব রচনা করেন। তিনি তাঁর এই ইনকারকে বাস্তব রূপ দিতে নিজেই তাঁর বিখ্যাত মাদরাসা **"জামেয়া হামীউস সুন্নাহ মেখল"** প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই মাদরাসাটিকে সম্পূর্ণ তাআফফুফ এবং তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ-এর এক অনন্য উসূল ও নিয়মনীতির ওপর পরিচালনা করেন, যা পুরো দেশবাসীর সামনে একটি স্বাধীন, মর্যাদাপূর্ণ ও আদর্শ ইসলামী মাদরাসার জ্যান্ত নমুনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

হযরত যখন লক্ষ্য করলেন যে, সমাজে সুন্নাতে নববীর পরিপন্থী কিছু নতুন নতুন বিদআতের (মনগড়া ইবাদত) জন্ম হচ্ছে—যেমন বিভিন্ন খতম, নাচ-গান ও ভণ্ডামী, অর্থের বিনিময়ে যিকিরের মজলিস এবং ফরয নামাজসমূহের সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত যৌথ মুনাজাত বা সম্মিলিত দোয়াকে আবশ্যক মনে করা (যে পদ্ধতি বা রূপ সাহাবায়ে কেরাম কিংবা তাবেঈনের যুগে ছিল না)—তখন তিনি এই সমস্ত বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নেমে পড়েন। তিনি এই বিষয়গুলোর উপর বহু রেসালা রচনা করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর দলিলভিত্তিক অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় মানুষের সামনে সঠিক সুন্নাতগুলো তুলে ধরেন। ফলে ইনসাফপরায়ণ ব্যক্তিরা তাঁর এই দাওয়াতকে সাদরে গ্রহণ করেন, অপরদিকে সত্য বুঝতে অক্ষম কিছু মানুষ তাঁর এই দাওয়াতের হাকীকত না বোঝার কারণে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে।

সে সময়ে যখন কিছু আলেম রাজনৈতিক ঝড়ের সামনে নতি স্বীকার করছিলেন কিংবা দ্বীনকে রক্ষার ঢাল হিসেবে মানব রচিত রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিলেন, তখন হযরত সবাইকে সমাজ পরিবর্তনের প্রকৃত নববী মানহাজ বা পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি আম্বিয়ায়ে কেরামের পথ অনুসরণে বিন্দুমাত্র ভয় পাননি; বরং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে হকের আওয়াজ বুলন্দ করে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান **"আইয়ুব খান"**-এর কাছে নসীহতমূলক চিঠি পাঠান। তিনি সম্পূর্ণ ইলমি ও মর্যাদাপূর্ণ গাম্ভীর্যের সাথে امر بالمعروف ونهي عن المنكر (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ)-এর মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক চিঠিটি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছিল, যার জবাবে আইয়ুব খান হযরতের মাকাম ও মর্যাদার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করে একটি উত্তরপত্র পাঠিয়েছিলেন।

মুফতি-এ-আজম হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ (রহ.) কখনোই স্রোতের অনুকূলে ভেসে যাওয়া কিংবা হকের প্রশ্নে আপোষ বা তোষামোদি করা আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী ফকীহ, যিনি সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর সর্বদা অটল অবিচল ছিলেন এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন।

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর ঐতিহাসিক সাক্ষ্য:

নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর একটি ফতোয়া পরীক্ষা বা যাচাই করার উদ্দেশ্যে সেটি মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর খেদমতে পাঠান, যাতে এই ফতোয়া সম্পর্কে তাঁর রায় বা মতামত জানা যায়। ফতোয়াটি যখন পৌঁছাল, তখন হযরত থানভী (রহ.) বিছানায় শুয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত মাওলানা আব্দুল করীম (রহ.) তাঁর সামনে ফতোয়ার ইবারত পড়ে শোনাচ্ছিলেন।

হযরত থানভী (রহ.) যখন হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর পেশকৃত ফিকহি ইবারতের সূক্ষ্মতা এবং মজবুত দালিলিক উপস্থাপনা শুনছিলেন, অমনি তিনি বিছানা থেকে সসম্ভ্রমে সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর ইলমি গভীরতায় মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে হযরত থানভী (রহ.) তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ জবান মুবারক দিয়ে তিন তিনবার বললেন: "অবশ্যই ইনি মুফতি! অবশ্যই ইনি মুফতি! অবশ্যই ইনি মুফতি!"

আল্লামা ইব্রাহিম বলিয়াভী (রহ.)-এর ঐতিহাসিক সাক্ষ্য:

বাংলার প্রখ্যাত আলেম এবং শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর খলীফা, হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান দেওয়ানপুরী (রহ.) একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন:

"আমি যখন দ্বিতীয়বার ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে সফরে যাই, তখন আসর নামাজের পর আল্লামা ইব্রাহিম বলিয়াভী (রহ.) আমার হাত ধরলেন এবং আমরা দুজনে কথা বলতে বলতে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটার এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন: 'আপনাদের ওখানের ফয়জুল্লাহর চিঠি আমার কাছে এসেছে।' এরপর তিনি আমার সামনে সেই ইলমি চিঠিটি পড়লেন এবং অত্যন্ত আফসোসের সাথে প্রশংসাসূচক বাক্যে বললেন: 'মুফতি ফয়জুল্লাহ বাংলার জমিনে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাঙালিরা তাঁর প্রকৃত কদর ও মাকাম বুঝতে পারেনি। তাঁর মতো একজন আলেম যদি দেওবন্দের জমিনে জন্মাতেন, তবে তিনি এমন সুউচ্চ সম্মান, মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করতেন যা তাঁর এই সুউচ্চ মাকাম ও মর্যাদার সাথে পুরোপুরি মানানসই হতো।'"

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল হক আজমী (রহ.)-এর সাক্ষ্য:

চট্টগ্রাম তাবলীগী মারকাজের শূরা সদস্য এবং মাহমুদিয়া মাদিনাতুল উলুম বাথুয়া মাদ্রাসার মুদাররিস, হযরত মাওলানা ইলিয়াস কাসেমী (হাফিজাহুল্লাহ) ভারতে তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ করে বলেন:

"আমি যখন দারুল উলূম দেওবন্দের তলেবে ইলম ছিলাম, তখন একদিন আমাদের উস্তাদ, বুখারী শরীফের মুদাররিস শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আব্দুল হক আজমী (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে তাঁর কামরায় যাই। আলোচনার এক পর্যায়ে মুফতি-এ-আজম হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর প্রসঙ্গ চলে আসে। তখন হযরত আজমী (রহ.) অত্যন্ত ইনসাফ ও শ্রদ্ধার সাথে উর্দূতে বলেন: 'اُن کے رسائل سے پتا چلتا ہے کہ اُن کے علم میں عُمق ہے' অর্থাৎ—'তাঁর কিতাব ও রেসালাসমূহ প্রমাণ করে যে, তাঁর ইলমের মাঝে গভীরতা রয়েছে।'

৬. তাঁর রচিত মুক্তাগাঁথা কিতাবাদি ও রিসালাসমূহ

হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর অধিকাংশ রেসালা বা পুস্তিকা ফারসি ভাষায় রচিত এবং তাঁর অনেক কিতাব আরবি ভাষাতেও রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত ও উল্লেখযোগ্য তাসনীফাত (রচনাবলী)-এর মধ্য থেকে কয়েকটি হলো: –

فيض الكلام لسيد الأنام عليه الصّلاة والسلام (وهو من الكتب الدراسي في أنحاء البلاد)
هداية العباد إلى سبيل الرّشاد
رافع الإشكالات على حرمة الاستيجار على الطاعات
إظهار المنكرات
الفيصلة الجليّة لأحكام السماع وسجدة التحيّة
أحكام الدّعوات المروّجة في هذه الأزمنة المتأخرة
محمود الأجوبة عن إثبات المناجات المروّجة بعد المكتوبة
إظهار الخيال
منكرات القبور
ترغيب الأمّة إلى تحسين النيّة (بالعربيّة)
تعليم المبتدي اللسان العربي
القول السديد في حكم الأحوال والمواجيد
ذمُّ الإكثار في إنشاد الأشعار
سراج التبليغ (ما هي الأمانة والخيانة)
الفلاح فيما يتعلّق بالنكاح (بالعربيّة)
الحقُّ الصريح في المسلك الصّحيح
إزالة الخبط والهميان في إثبات رؤية هلال العيد ورمضان
إنجاح الحاجات بتعريب رسالة راه نجات
تحفة الطالبين في تحقيق خطبة المصنفين
إظهار المنكرات الشائعة في المدارس والجلسات الرائجة
دفع الاعتساف في أحكام الاعتكاف
توضيح البيان في حكم طلاق الغضبان
ترغيب الأمّة باتباع السّنة
إصلاح النفوس
مقالات مفتي أعظم (مجموعة بعض مقالاته العلميّة في مواضع شتى)
مكتوبات مفتي أعظم (بعض مكتوباته إلى بعض الأقرباء أو إلى أكابر الزمان)

رسائله المنظومات:

پند نامہ خاکی – منظوماتِ خاکی – مثنوی دلاویز وغيرها من الرسائل

তাঁর রচিত মুক্তাগাঁথা ফারসি কাসিদাসমূহের (কাব্যগ্রন্থের) কয়েকটি নমুনা নিচে পেশ করা হলো:—

<u>دلائل وجود صانع عالم و بودن عقل قاصر از ادراک جمیع احکام دیں و بودن طورِ نبوت ورائے طورِ عقل</u>

نیز ایں دین و قرآن و کائنات - بلکہ ہر ہر جزو جملہ ممکنات

ہیں گواہانند داں ائے نیکخو - بر وجودِ صانع و توحیدِ او

ذاتِ پیغمبرؐ و ہم قرآن بیں - ہم حدیث و جملۂ احکامِ دیں

ہر یکے زیںہا دلیلِ شافی اند - بہرِ عاقل رہنمائے کافی اند

بر وجودِ صانع و بر صحتِ دیں - نیز بر حقّیت و صدقِ امیں

غور کن تو اندریںہا جانِ من - بر تو روشن گردد آخر ایں سخن

غور می کن اندریںہا یارِ من - کاملُ الایمان بگردی بے سخن

عقلِ کامل قولِ مخبر اے حبیب - گر بود صادق دلیل اند اے لبیب

اے بسا چیزے کہ تو نا دیدہ ای - تو بداں قائل و ہم گردیدہ ای

– پند نامہ خاکی

<u>অনুবাদ</u>

জগৎ-স্রষ্টার অস্তিত্বের দলিলসমূহ, দ্বীনের সমস্ত আহকাম অনুধাবনে মানব বুদ্ধির অক্ষমতা এবং নবুওয়তের মাকাম যে মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তার ঊর্ধ্বে—তার বিবরণ।

হে সৎস্বভাবী পাঠক! জেনে রাখো, এই দ্বীন, পবিত্র কুরআন এবং এই কায়েনাত—বরং সম্ভাব্য সবকিছুর (সমগ্র সৃষ্টিজগতের) প্রতিটি অণু-পরমাণু—সেই মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং তাঁর তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রকাশ্য সাক্ষী।

তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা ও জীবনচরিত্র এবং পবিত্র কুরআনের দিকে তাকাও; একই সাথে হাদীস শরীফ এবং দ্বীনের সমস্ত আহকামের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। এগুলোর প্রতিটিই এমন এক একটি অকাট্য দলিল, যা একজন বুদ্ধিমান মানুষের হেদায়েত ও সঠিক পথ পাওয়ার জন্য একেবারেই যথেষ্ট।

হে আমার প্রিয় ! তুমি স্রষ্টার অস্তিত্ব, দ্বীনের সত্যতা এবং সেই ‘আমীন’ (বিশ্বস্ত রাসূল)-এর হাকীকত ও মহাসত্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে ফিকির করো; তবে পরিশেষে এই মহাসত্যের বাণী তোমার কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

হে আমার বন্ধু! তুমি এগুলোর মাঝে গভীরভাবে ফিকির করতে থাকো, তাহলে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই তুমি কামেল ঈমানদার হয়ে যাবে। হে প্রিয় বুদ্ধিমান! সুস্থ ও নিখুঁত বুদ্ধি এবং সত্যবাদী সংবাদদাতার বাণী—হক আদায়ের জন্য অত্যন্ত মজবুত দলিল।

এমন বহু বিষয় ও বস্তু রয়েছে যা তুমি কখনো নিজের চোখে দেখনি, অথচ অন্যান্য অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে তুমি তা মনেপ্রাণে স্বীকার করো এবং তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছ। *(— পন্দনামায়ে খাকী)*

<u>إرشاد الأمّة إلى التفرقة بين السنة والبدعة</u>

رسمہا کت خوب بنماید بچشم - ہمچو طاعت ظاہرش آید بچشم

یعنی رسم فاتحہ وعرسہا - رسم مولودہا و دیگر رسمہا

تو برنگِ ظاہرش غرّہ مشو - بدعتِ موصوف با حسنش مگو

آن نماز ش کہ رغائب بود نام - در کتب ردّش ببیں اے نیکنام

آنکہ بعدِ عطسہ او کردہ سلام - پیشِ ابنِ عمر بر خیر الانام

ابن عمرش کرد انکار آن زمان - کز نبی منقول ہرگز نے چناں

نیز مَرد وی در جبانہ روزِ عید - نفل خواندن خواست پس او را بدید

مر علیؓ پس شد ورا مانع ازاں - کز نبی نامد نمازی آنچناں

مثلِ ایں اندر کتب بسیار ہست - داں نمونہ مشتے از خروار ہست

ایک چوں تقییدِ مطلق آمدہ - در رغائب بیں چہ ناحق آمدہ

بے محل شد آن نماز و آن سلام - قابلِ انکار شد زان لا کلام

کین تعدیِ حدود شرعی است - پس قبیح شد کز اصول فِقہیہ است

چیز ہا گردد قبیح از غیرِ ہم - ایں سخن حق ست ہرگز زیں مَرم

رسمہا را کن بریہنا تو قیاس - حسنہا از قبحہا نیکو شناس

– منظوماتِ خاکی

অনুবাদ:

<u>সুন্নাত ও বিদআতের পার্থক্য</u>

বিদআতি রীতিনীতিগুলো বাহ্যিকভাবে চোখের সামনে অত্যন্ত চমৎকার মনে হয় এবং এর বাহ্যিক রূপটি ইবাদত-বন্দেগির মতোই নজরে আসে।

যেমন প্রচলিত ফাতিহা ও ওরসসমূহের প্রথা, ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের প্রথা এবং এই জাতীয় অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা।

তুমি এগুলোর বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে ধোঁকায় পড়ে যেয়ো না এবং এই ধরণের বিদআতকে 'বিদআতে হাসানা' (উত্তম বিদআত) আখ্যা দিও না।

যে নামাজটির নাম 'সালাতুর রাগায়েব' (একটি মনগড়া নফল নামাজ), নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে তার খণ্ডন ও নিষেধাজ্ঞা দেখে নাও, হে নেককার ভাই!

(সুন্নতের পরিপন্থী আমলের খণ্ডনে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান তুলে ধরে বলেন—)

এক ব্যক্তি হাঁচি দেওয়ার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরুদ ও সালাম পেশ করেছিল; তাও আবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সামনে।

হযরত ইবনে উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ তার এই আমলের প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন—নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তো এভাবে (হাঁচির জবাবে আলহামদুলিল্লাহর সাথে দরুদ মেলানোর কথা) কখনই বর্ণিত বা মনকুল হয়নি।

অনুরূপভাবে, এক ব্যক্তি ঈদের দিন ঈদগাহে (নামাজের আগে বা পরে) নফল নামাজ পড়তে চাইল, তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে দেখে ফেললেন।

হযরত আলী (রা.) তাকে এই আমল থেকে বাধা দিলেন; কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঈদগাহে ওই সময়ে এমন কোনো নামাজের প্রমাণ আসেনি।

এই জাতীয় বহু উদাহরণ নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে বিদ্যমান রয়েছে; তুমি এগুলোকে ‘নমুনা’ হিসেবে চিনে রাখো, যা কেবল সমুদ্রের মাঝে এক ফোঁটা বিন্দুর মতো (খুব অল্প কিছু উদাহরণ) ।

কোনো সাধারণ আমলকে যখন শরিয়তের দলিল ছাড়াই নির্দিষ্ট নিয়ম বা সময়ের ফ্রেমে বেঁধে দেওয়া হয় (তাকয়ীদে মুতলাক), তখন তা 'সালাতুর রাগায়েব'-এর মতোই অন্যায় ও বাতিল আমল হিসেবে গণ্য হয়।

উপযুক্ত স্থান বা শরিয়তের অনুমোদন ছাড়া হওয়ার কারণে সেই নামাজ এবং সেই দরুদ-সালাম নিশ্চিতভাবেই ওলামায়ে কেরামের কাছে ইনকার বা বর্জনের যোগ্য হয়ে গিয়েছে।

কেননা, এই ধরণের মনগড়া নিয়ম তৈরি করা শরিয়তের সুনির্দিষ্ট সীমানা লঙ্ঘন করার শামিল; আর ফিকহের উসূল (اصول فقه) অনুযায়ী এটি একটি অতি নিকৃষ্ট ও কদর্য আমল।

অনেক ভালো কাজও শরিয়ত পরিপন্থী বাহ্যিক কারণ যুক্ত হওয়ার দরুন নিকৃষ্ট বা নাজায়েয হয়ে যায়; এটি একটি মহাসত্য কথা, এ থেকে কখনোই মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

সমাজে প্রচলিত সমস্ত মনগড়া রীতিনীতিকে তুমি এই নিয়মের ওপর কিয়াস (তুলনা) করো; তবেই তুমি ভালো ও মন্দের (সুন্নাত ও বিদআতের) মাঝে সুন্দরভাবে পার্থক্য করতে পারবে। *(— মনযূমাতে খাকী)*

যিনিই হযরতের এই সমস্ত কিতাবাদি ও রেসালাসমূহ গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করবেন, তিনি দেখতে পাবেন যে—এগুলো আকারে ছোট ও সংক্ষিপ্ত ইবারতে লেখা হলেও এর মূল মাযমূন, গভীরতা ও গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলো কেবল কোনো সাধারণ বা সাময়িক ফতোয়া নয়; বরং কায়দা-কানুন (উসূল) ও সুনির্দিষ্ট শরিয়ী মূলনীতি (যাওয়ায়েত)-

এর চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তাহকীক এবং ফিকহি যোগ্যতা (মালকা) গড়ে তোলার এক গভীর ইলমি গবেষণা। যা তালেবে ইলম ও ওলামায়ে কেরামের জন্য দ্বীনের গভীর সমঝ (তাফাক্কুহ ফিদ্দীন) অর্জনের পথকে সুগম করে এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর ছায়াতলে থেকে গভীর ইলম অর্জন ও সঠিকভাবে শরয়ী হুকুম আহরণ করার দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

৭. চিরন্তন সফর ও রফিকে আলার সান্নিধ্যে গমন (ইন্তেকাল):

ইলম বিতরণ, কিতাব তাসনীফ, দ্বীনের প্রচার-প্রসার এবং উম্মতের নতুন প্রজন্মকে তরবিয়ত দেওয়ার এক গৌরবোজ্জ্বল ও দীর্ঘ যিন্দেগী শেষ করে হযরত মুফতি ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর সেই অবধারিত মহাপ্রয়াণের সময় ঘনিয়ে আসে। তাঁর ইন্তেকালের সেই দৃশ্যটি ছিল অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ, যা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইলমের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও নিমগ্নতার এক জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করে।

১৯৭৬ ঈসাব্দের ৬ই অক্টোবর, মোতাবেক ১৩৯৬ হিজরির ১১ই শাওয়াল, রোজ বুধবার, ঠিক বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে হযরতের পবিত্র রূহ মহান প্রভুর সান্নিধ্যে পাড়ি জমায়। ইন্তেকালের ওই মুহূর্তে দ্বীনি ইলমের অত্যন্ত বরকতময় দুটি কিতাবের যেকোনো একটি—হয় 'সহীহ বুখারী' অথবা ফিকহ শাস্ত্রের 'হেদায়া' কিতাবটি—তাঁর বুকের ওপর রাখা ছিল এবং তিনি সেটির মুতালাআ ও সূক্ষ্ম তাহকীকে মগ্ন ছিলেন। তিনি যেভাবে ইলমি যিন্দেগী কাটিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই তাঁর মউত নসীব হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, কিয়ামতের ময়দানেও তিনি ইলমে নববীর ধারক-বাহক ও দ্বীনের এক মহান খাদেম হিসেবেই পুনরুত্থিত হবেন।

আল্লাহ তাআলা হযরতকে রহমতের চাদরে আবৃত করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের সুউচ্চ মাকাম নসীব করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সমাপ্ত